।।ওতম্।।

সত্যার্থপ্রকাশ – এক মূল্যাঙ্কণ

জ্বালাপুর, হরিদ্বার

ডঃ চন্দ্রভানু দরিদ্র একটি ছেলেকে দিয়ে গবেষণা (research) করাচ্ছিলেন। সেই ছাত্রকে নির্দেশ দিতে তিনি অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করলেন। কিন্তু যখন তিনি সত্যার্থপ্রকাশ পেলেন, তখন বল্লেন যে, বছরে পর বছর ধরে রাত-দিন পরিশ্রম করে যা আমি উপলব্ধি করেছি তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী জ্ঞান আমি এই একটা পুস্তকে পেয়েছি। আমার দুর্ভাগ্য যে, এই গ্রন্থটি আমি প্রথমে পাঠ করিনি। বাস্তবিকপক্ষে, সত্যার্থপ্রকাশ জ্ঞানের ভাণ্ডার। হিতোপদেশে শাস্ত্রের পরিভাষা এইরূপ–

অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম্।
সর্বস্য নেত্রং শাস্ত্রং য়স্য নাস্ত্যন্ধ এর সঃ।।

শাস্ত্র অনেক সন্দেহ নিবারক, পরোক্ষ জ্ঞানের দর্শক, তথা সকলের আন্তরিক নেত্র। যার কাছে শাস্ত্ররূপী নেত্র নেই সে বস্তুতঃ চোখ থাকতেও অন্ধ–শাস্ত্রের এই সব লক্ষণগুলি সত্যার্থ প্রকাশে ঘটে। তা পাঠ করলে বহু প্রকার সন্দেহের নিবৃত্তি হয়। জগতের সৃষ্টি কীভাবে হল, কোথায় হয়েছিল, মৃত্যুর পর জীবের কী গতি হয় ইত্যাদি অনেক অপ্রত্যক্ষ তথ্যের উদ্ঘাটন হয় এবং জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করতে তা পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সত্যার্থ প্রকাশ পাঠ না করা ব্যক্তি জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্ধ।

১. সন্দেহ নিবারক –

সমস্ত সত্যার্থপ্রকাশ পড়ে যান, তার মধ্যে এমন একটা পৃষ্ঠা

পাবেন না যেখানে সন্দেহের নিবৃত্তি করা হয়নি। অনেক ধার্মিক জটিলতায় পড়া লোকেরা সত্যার্থপ্রকাশের মাধ্যমে পথ খুঁজে পেয়েছেন। সত্যকে স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল দেখাতে সত্যার্থ প্রকাশের তুলনা হয়না। তা পাঠ করে এমন মনে হয় যেন ব্যক্তি অন্ধকারে প্রকাশের সন্ধান পেয়েছে। 'তমসো মা জ্যোতিগময়'-র প্রার্থী এটি অবশ্যই পাঠ করবেন — দিগ্‌দর্শন হবে।

বিদ্যুৎ–বিভাগে কর্মরত যুবক একদিন বলল যে,''আমি আর্য সমাজী কী করে হলাম।'' সে বলল যে, সে গ্রামে থাকে, ধর্মের প্রতি তার রুচি বাল্যকাল থেকেই ছিল। তাদের গ্রামে শিব মন্দির ছিল। সে প্রতিদিনি মন্দিরে যেত, শিবের দর্শন করত এবং তার উপর জল দিয়ে আসত। কিছু বুঝতে শিখলে কাউকে 'শিব শিব', কাউকে 'জয় মাতা দী' ইত্যাদি বলতে শুনে তার বাল্যমনে এই ভাবের উদয় হল যে, এর মধ্যে আসল ও সত্য ভগবান কোন্‌টি ? একদিন আমাদের গ্রামে এক সাধু আসে তিনি গাঁজা-ভাঙ খেতেন এবং তাঁর নিকটে যে যেত তাকেও খাওয়াতেন। আমি যদিও তাঁর এই কাজ ভাল চোখে দেখতাম না তবুও একদিন তাঁর কাছে গিয়ে নিবেদন করলাম, মহারাজ, আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে যে, আসল ভগবান কে ? তিনি শৈব ছিলেন। তিনি বললেন – আসল ও সবচেয়ে বড় ভগবান হল শিব, সব দেবতা তাঁর সামনে করযোড়ে থাকে এবং ত্রাহি মাম্, ত্রাহি মাম্ বলতে থাকে, সবাই তাঁর পূজা করে। ভগবান রামও লঙ্কা আক্রমণ করার পূর্বে তাঁর পূজা করেছিলেন। রাম তো বিষ্ণুর অবতার ছিলেন। যখন বিষ্ণুকেও বিজয় প্রাপ্তির জন্য শিবের আশ্রয় নিতে হয় তখন এর মধ্যে কী কোন সন্দেহ থাকে যে, সবচেয়ে বড় শিব। অন্যান্য

দেবতা তো অল্প-স্বল্প দেয় কিন্তু শিব হলেন বিলক্ষণ দানী। সব কিছু নিজের ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। নিজের কাছে কিছুই রাখেন না। তাঁর কথা শুনে আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হলাম এবং তখন থেকে পাক্□া শিবভক্ত বনে গেলাম এবং তাঁর দেওয়া মন্□ 'ওঁ শিবায় নমঃ' শ্রদ্ধাসহ জপ করতে থাকলাম। এখন আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

কিন্তু সম্ভবত আমার ভাগ্যে শান্তি ছিল না। হল এই যে, আমাদের গ্রামের প্রধান দেবীর জাগরণ করালেন। ধার্মিক অনুষ্ঠান মনে করে আমিও তাতে সম্মিলিত হলাম। সারা রাত্রি দেবীর গুণগান শুনে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। ভজন ও প্রবচনের মাধ্যমে দেবীর অপূর্ব মহিমা গীত হল। পুত্রহীনকে মা পুত্র দিলেন, নির্ধনকে ধন দিয়ে মুড়ে দিলেন, বিপদ্‌কালে ভক্তের রক্ষা করলেন, মৃতকে জীবিত করে দিলেন, অসুরদের সংহার করলেন। কী অদ্‌ভূত মহিমা এই দেবী মায়ের। আমি তো প্রথম বার কোন দেবতার এত মহিমা শুনলাম। সকালে জাগ্রত হয়ে আমি মন্ডলীর অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করলাম এবং তাঁর সম্মুখেও সত্য ভগবান কে – এই প্রশ্ন রাখলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন – মা বড়, না ছেলে ? আমি বললাম – মা-ই বড় হয়ে থাকে। তিনি বললেন–মা কি দেবী না শিব ইত্যাদি ? আমি বললাম – দেবীই মা। তিনি বললেন যে, শিবের মাহাত্ম্যও শক্তিরূপিনী মায়ের কারণে। যদি শিব থেকে শক্তিরূপী 'ই' বের করে দেওয়া হয় তাহলে শিব শবে-এ পরিণত হয়। এবং জানো কি, শব কাকে বলে ? মড়াকে। বল, মড়া কি কিছু করতে পারে ? যখন তার সাথে শক্তিরূপী 'ই' যুক্ত হয় তখন সে শিব হয় যায় এবং লোকদের দ্বারা পূজিত হয়। সুতরাং আসল তত্ত্ব তো দেবী রূপী শক্তি। সেই সত্য,

মহান ও আসল।

তাঁর কথা শুনে আমার নিজের পূজার উপর খুব অনুতাপ হল। এতদিন আমি শিবের উপাসনা করেছি। দেবী মাকে ধন্যবাদ যে, তাঁর অনুগ্রহে আমি তাঁর সত্যরূপের দর্শন করলাম। সত্যিই দেবীর মহিমা অপার, সেই জন্যই তো তাঁর ভক্তরা সারা রাত দেবীর মহিমা গান করে ক্লান্তি বোধ করে না। পরে জানা গেল যে, তারা মদ্যাদি পান করেও গান করে। কিন্তু সেই সময় শেরাঁওয়ালীই আমার আরাধ্য হয়ে গিয়েছিল। সত্যিকার সঙ্গী পাওয়া গেলে কেউ কি পুতুলের সঙ্গে খেলা করে ? আমি মায়ের ভক্ত ও প্রচারক হয়ে গেলাম। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে গেলেও সেখানে সবাইকে দেবীর গীত শুনিয়ে তাঁর ভক্ত হবার চেষ্টা করতাম।

আমার এই পাগলামি এক বছরও গেল না যে, আমার মনে একটা ধাক্□া লাগল। আমাদের গ্রামে ব্রাহ্মণদের এখানে জনৈক সন্ন্যাসী এলেন। তিনি কারও হাতের রান্না খেতেন না। নিজের ভোজন নিজ হাতে তৈরী করতেন। সংস্□্তে কথা বলতে পারতেন। তাঁর ব্যাখ্যানে তিনি ভগবান বিষ্ণুর মহিমা বর্ণনা করতেন। ভগবান কী করে মোহিনী রূপ ধারণ করে অসুরদের থেকে অমৃতের রক্ষা করলেন। যদি তিনি এরকম না করতেন তাহলে অসুর অমৃত পান করে অমর হয়ে যেত। কীভাবে অবতার নিয়ে অসুরদের সংহার করে নিজের ভক্তদের রক্ষা করলেন। কেমন করে সুদর্শন চক্র দ্বারা রাহুর মাথা কেটে ফেললেন ইত্যাদি।

একদিন আমি তাঁর চরণে প্রণাম করে আমার সমস্যা তাঁর সামনে রেখে বললাম — প্রভু, আসল ভগবান কে যিনি সর্বজেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ? আমার কথা শুনে তিনি হেসে বললেন – ভগবান্

কি অনেক ? আমি তাঁকে বললাম যে, শিব, গণেশ, দেবী ইত্যাদি সবাই তো আছে। তিনি বললেন – এদের সবাইকে দেবতা বলা যেতে পারে, ভগবান নয়। ভক্তদের রক্ষা এবং অসুর নিধন হেতু ভগবান অনেক বার অবতার নিয়েছেন, তুমি কি বলতে পার যে, তিনি কার অবতার ছিলেন ? আমি বললাম – বিষ্ণু ভগবানের। বললেন – যার এই সব অবতার হয়েছে তিনি আসল হলেন কি অন্য ?

আমার চোখ থেকে পর্দা সরে গেল। সত্যিই তো, গণেশ দেব, মহাদেব ও দেবী এরা তো দেবতাই, ভগবান্ কোথায় ? সব কথক ঠাকুররাই বলেন যে, সৃষ্টির পাপ ধ্বংস করতে, ভক্তদের উদ্ধার করতে এবং অসুরদের নিধন করতে ভগবান মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধের অবতার গ্রহণ করেছেন অথবা কল্কি অবতারও নেবেন–সে সব তো বিষ্ণুরই অবতার, বাস্তবে বিষ্ণুই ভগবান্। ক্ষীর সাগরে শেষ-শয্যার উপর শায়িত, লক্ষ্মী যার পা টিপে দিচ্ছে, এমন ভগবান্‌কে ছেড়ে অন্যের পূজা করা কোথাকার বুদ্ধিমত্তা ? যে লক্ষ্মীর পিছনে সংসার দৌড়ায় সে তো তাঁর চরণের দাসী। লোকেরা সত্যই বলে যে, গুরু কোন বিদ্বান্‌কেই করা উচিত। বিদ্বান্ না পাওয়ার কারণে আমি এ যাবৎ দেবতাদেরই পিছনে ঘোরাঘুরি করছি। এখন খোঁজ পাওয়া গেল আসল ভগবানের। আসল ভগবান্ তো বিষ্ণুই। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। আসল ভগবানের খোঁজ যে পেয়ে গিয়েছি।

কিন্তু এই অভিভূত হওয়ার ভূত বেশী দিন স্থায়ী হল না। আমি কার্তিকের পূর্ণিমায় হরিদ্বার গেলাম। সেখানে এক দোকানদারের কাছে অনেক স্তোত্রের বই ছিল। আমি বিষ্ণু স্তোত্র চাইলাম। সে দিয়ে দিল। সস্তাই ছিল। মাত্র ১ টাকা করে। আমি

সস্তা দেখে অনেকগুলি স্তোত্র নিয়ে নিলাম। দেখতে আপত্তি কী ? কী জানি, কোন্‌টার মধ্যে থেকে কোন কাজের জিনিস বেরিয়ে আসতে পারে। তার মধ্যে যারই আমি স্তোত্র পড়ি না কেন, সেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হত। আমি ভাল ঝঞ্ঝাটে ফেঁসে গেলাম। যদি কেবল বিষ্ণু স্তোত্রই কিনতাম এবং অন্যদের না নিতাম তাহলে ভাল ছিল। কিন্তু কী করব ? আমার দুর্ভাগ্য যে, সস্তার মোহে এতগুলি কিনলাম। তার মধ্যে চন্ডীদেবী, বৈষ্ণবদেবী তথা সন্তোষ দেবীর মহিমা যদি দেখো তাহলে এরা সবাইকে পিছনে ফেলে দেবে, আমি কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেলাম। কার স্তুতি করব, কাকে ছাড়ব, আমি এই নির্ণয় করতে অক্ষম। ভাল, হবন করতে গিয়ে হাত পুড়ল।

তারপর আমি ভাবলাম যে, কেউ যাতে ক্ষুব্ধ না হয়, একদিন একটা স্তোত্রের পাঠ করতাম এবং দ্বিতীয় দিন অন্য। এই ভাবে সবাইর পালা এসে যেত। আমারও সন্তুষ্টি হল যে, ঠিক আছে, সবাই প্রসন্ন থাকবে যে, আমাদেরও একজন ভক্ত আছে। আমি খুশী হলাম এই ভেবে যে, পরমাত্মা আমার মুশকিল লাঘব করে দিয়েছেন। কিন্তু এই মানসিক শান্তিও বেশী সময় পর্যন্ত স্থির থাকল না। একদিন আমার মনে হঠাৎ উদয় হল যে, সবাই বলে ভগবান্ এক এবং আমি অনেক দেবতার স্তুতি করছি। এদের মধ্যে যে সত্য হবে সে কি অসন্তুষ্ট হবে না যে, এ আমাকেও অন্যের সমান মনে করে ? রাজা ও চাপরাসীকে যদি সমান সম্মান দেওয়া হয় তবে রাজাকে কি খারাপ লাগবে না ? ভাল আপদ গলায় ঝুলালাম। কাউকে জিজ্ঞাসা না করলে ভাল ছিল। নিজের শিবের উপর জল দিয়ে আসতাম, না কারও ছোট-বড় নিয়ে ঝগড়া ছিল, আর না ভয় পাওয়ার বা ঘোরাঘুরি করার। কিন্তু এখন তো আপদ গলায়

ঝুলিয়েই ফেলেছি। এখন তো ভগবানই এর থেকে মুক্তি দিতে পারেন। আমি প্রত্যেক আগন্তককে জিজ্ঞাসা করি কিন্তু সবাই আগের মত জটিলতায় ফেলে দেয়, সমাধান কেউ করে না। সবাই নিজের নিজের আরাধ্যদেবকে বড় বলে। আমি তো চিন্তায় শুকিয়ে গেলাম।

কিন্তু আমার ভাগ্য জেগে উঠল। আমাদের গ্রামের একটা মেয়ের বিবাহ এক আর্যসমাজী পরিবারে হল। তাদের বিবাহ সংস্□ারও অদ্ভুত ছিল। না তারা গণেশ পূজা করল, না নবগ্রহের। যজ্ঞ হল এবং প্রত্যেক বিধির অত্যন্ত সুন্দর ব্যাখ্যা করা হল। আর্য সমাজের সঙ্গে আমার কোন প্রেম ছিল না কেননা আমাকে বলা হয়েছিল যে, এরা নাস্তিক ও ঝগড়াটে হয়। এরা রামকে মানে না, না কৃষ্ণ, না দেবী, না গণেশ, না শিব বা বিষ্ণুকে মানে। কিন্তু যেহেতু আমাদের গ্রামে প্রথম আর্যসমাজী সংস্□ার ছিল সুতরাং তাই দেখার জন্য গ্রামের মহিলা-পুরুষ সমবেত হয়েছিল। তার মধ্যে শ্রদ্ধাভাজনদের সংখ্যা কম, তামাশা দেখার লোক বেশী ছিল। সংস্□ারের সময় সব কিছু অত্যন্ত শান্তিপূর্বক হয়। শিশুরাও ছিল চুপচাপ। কারোর কিছু বলার দরকার হলে বাইরে গিয়ে কথা বলতে বলা হত। সংস্□ার দেখে সমস্ত গ্রাম প্রভাবিত না হয়ে পারল না। সবার মুখে একটা কথা যে, এরকম সংস্□ার আমরা জীবনে দেখিনি। এখন তো আমরা জানতে পারলাম যে, বর-বধূর কী কর্তব্য হয়। লাজা হোম, সপ্তপদী ইত্যাদির কী গুরুত্ব! শুধু একটা কথা তারা আলোচনা করত যে, পরিক্রমা সাতটির জায়গায় চারটি হয়েছে। পরে জানতে পারলাম যে, গৃহ্যসূত্রে চারটি পরিক্রমার উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবতঃ তারা সপ্তপদীর জায়গায় সপ্ত পরিক্রমার কথা ভেবে নিয়েছে। তবুও সেই সংস্□ারের কথা সারা গ্রামে ছড়িয়ে

পড়ে এবং কয়েক মাস ধরে চর্চা চলতে থাকে।

এক দিন আমারও মনে হল যে, আমি কখনও সেই সব আর্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। হতে পারে তাদের কাছে আমার সমস্যার কোন সমাধান পাওয়া যাবে। কারও নাস্তিকতা নিয়ে আমি কী করব, তারা কথা তো বুদ্ধিপূর্বক করে। আমি তাঁকে বলে আসলাম – 'কাকু, আপনাদের ওখানে কোন আর্য পুরুষ এলে, আমাকে, একটু খবর দেবেন, তাঁর কাছে আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে।' সেই ভাবে গ্রামে একদিন হল্লা পড়ে গেল যে, সেই আর্য ভদ্রলোক এসে গেছেন। তিনি মেয়েটিকে ছাড়তে এসেছিলেন। আমি জানতে পেরে সকালেই সেখানে পৌঁছে গেলাম। পরিবারের মুখ্য লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম—'তিনি কোথায় আছেন ?' উনি বললেন – 'উপরে ছাদে সন্ধ্যা করছেন।' আমি যেন একটা ধাক্□া খেলাম। নাস্তিক ও সন্ধ্যা করছে। তাঁরা সন্ধ্যা কী ভাবে করেন ? আমি গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করে বিচিত্র মনে হল। আমি দেখতে চেয়েছিলাম যে, এবং তার থেকে চুপ্‌চাপ থাকার আদেশ মেনে নিয়ে উপরে গেলাম। তিনি চোখ বন্ধ করে, ধ্যানমগ্ন হয়ে কিছু মন্□ ফিস্‌ফিস করে বলছিলেন। আমিও ছাদের উপর বসে তাঁর নকল মন্□বিহীন ভাবে করতে লাগলাম। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতে শুরু করলাম। যখন তিনি উঠলেন, আমি তাঁর চরণ-স্পর্শ করে জিজ্ঞাসা করলাম–' আপনি কী করছিলেন ? তিনি বললেন যে, সন্ধ্যোপাসনা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, লোকেরা আর্যসমাজীকে নাস্তিক কেন বলে ? তিনি জবাবে বললেন – 'আমরা পরমপিতা পরমাত্মার বেদবাণীকে প্রমাণ মানি এবং তাঁর দ্বারা নির্দিষ্ট কার্য করার চেষ্টা করি। সন্ধ্যোপাসনাও আমরা বেদ ও ঋষিদের পদ্ধতি মতো করে

থাকি। অন্যান্য লোকেরা খেয়াল-খুশী মতো পুরাণকে প্রমাণ মেনে পূজাদি করে। আমরা সেই রকম করি না, সুতরাং তারা আমাদেরকে নাস্তিকাদি বলে বদনাম করতে থাকে।' আমি – আপনারা রামকৃষ্ণ ইত্যাদিকে মানেন না কেন ? তিনি হেসে বললেন – রামকৃষ্ণকে যারা মানেনা, তাদের আর্য পর্ব পদ্ধতিতে জন্মাষ্টমী, সীতাষ্টমী ও রামনবমীর পর্ব পালন করার উল্লেখও দেখেছ, না শোনা কথা বলছ ? আমি বললাম যে, লোকেরা বলে থাকে যে, আর্য সমাজ রাম-কৃষ্ণাদিকে মানে না, এই জন্য জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন – ''বেদে ভগবান্‌কে অকায়ম্ অর্থাৎ শরীর রহিত বলা হয়েছে। শরীরধারী তো জীব হয়, পরমাত্মা নয়। সেই হিসাবে আমরা রাম-কৃষ্ণাদিকে মান্য ঐতিহাসিক পুরুষ স্বীকার করি এবং তারা এদেরকে ভগবানের অবতার মানেন। আমরা তাদেরকে পরমাত্মা মানিনা বলে তারা আমাদের উপর অভিযোগ করে যে আমরা তাদেরকে মানিই না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম – রাম-কৃষ্ণ কি ভগবানের অবতার ছিলেন না ?'' তিনি – অবতারের অর্থ অবতরণ করা বা নামা, অবতরণ করা একদেশীর পক্ষে সম্ভব হতে পারে কিন্তু সর্ব ব্যাপকের নয়। দ্বিতীয়, এমন কোন কাজ কি আছে যা পরমাত্মা করতে পারেন না ? তিনি তো সর্বশক্তিমান। সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতিও প্রলয়ের মতো মহান্ কর্ম কারও সাহায্য না নিয়ে, শরীর ধারণ না করে, করেন, তখন কোন ব্যক্তিবিশেষকে মারার জন্য তাঁকে তাঁর নিয়ম ভেঙে শরীর ধারণ করতে হল ? সৃষ্টির প্রলয় তো শরীর ধারণ না করে করলেন কিন্তু রাবণ-কংসাদি মারার জন্য শরীর ধারণ করতে হল ? বিনাশ করার চেয়ে নির্মাণ কার্য কঠিন। ভব্য ভবনের নির্মাণ সকলে করতে পারেনা কিন্তু তা ধ্বংস সকলেই করতে পারে। সুতরাং অবতার মানলে পরমাত্মায়

অপূর্ণতা মানতে হবে। তিনি অন্য তর্ক ও প্রমাণ উপস্থাপিত করলেন।

কথা বলতে বলতে আমরা নীচে নেমে আসলাম, তিনি বসার পর আমি ওনাকে বললাম যে, অনেক দিন থেকে আমার মনে একটা সংশয় আছে। সেটা এই যে, সবচেয়ে বড় ভগবান কে। তিনি বললেন – ''আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'' আমি পরিষ্কার করার ভঙ্গিতে বললাম যে, আমার প্রশ্ন হল এই – শিব-ব্রহ্মা-বিষ্ণু-দেবী ইত্যাদির মধ্যে বড় কে ? তিনি বললেন যে, এমনি এমনিই জিজ্ঞাসা করবে ? আমি ''আপনি যা ইচ্ছাতাই নিন কিন্তু এই ঝঞ্ঝট থেকে আমাকে মুক্ত করুন। এ আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। আমি সারা জীবন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।'' তিনি-এ বলার ফিস পাঁচ টাকা লাগবে। আমি – আপনি যা ইচ্ছা, পঞ্চাশ টাকাও নিতে পারেন কিন্তু এই ভূত থেকে আমাকে রেহাই দিন। আমি পাঁচ টাকা দিলাম এবং তিনি থলির মধ্যে থেকে সত্যার্থপ্রকাশ বের করে আমায় দিলেন এবং বললেন যে, এ বইটি অজ্ঞান জনিত লক্ষ রোগের একমাত্র ঔষধ।

আমি ঘরে এসে সত্যার্থ প্রকাশ পড়ে নিজের বোকামির উপর আমার খুব হাসি পেল। ছোট-বড়র ব্যাপার আমি যাদেরকে নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছিলাম তারা তো একই পরমাত্মার গুণবাচক বিভিন্ন নাম। তিনি কল্যাণ করেন বলে শিব (শিবু কল্যাণে), ব্যাপক বলে বিষ্ণু (বিষ্লৃ ব্যাপ্তৌ) জগৎক্রীড়া ইত্যাদির জন্য দেব বা দেবী নামে অভিহিত হন। যে সংশয় আমি বছরের পর বছর মনের মধ্যে পালন করে রেখেছি, যার কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তা সত্যার্থ

প্রকাশের প্রথম সমুল্লাসেই হয়ে গেল। এইরূপ সত্যার্থ প্রকাশ সহস্র অন্ধকারময় জীবনে আলোর সঞ্চার করেছে। যে রকম সংশয় মনে উঠুক না কেন তার নিরাকরণ সত্যার্থ প্রকাশের কোথাও না কোথাও অবশ্যই পাওয়া যাবে।

২. সত্যার্থ প্রকাশ জীবন-দর্শক —

আমার নিজের জীবনের ঘটনা। আমি পড়াশোনায় পরিশ্রম করতাম এবং ভাল ছাত্র হিসাবে নাম ছিল। একবার জনৈক জ্যোতিষী আমাদের গ্রামে এসে রাষ্ট্র করে দেন যে, তিনি হাত দেখে লোকের ভূত-ভবিষ্যতের কথা বলতে পারেন। আমাদের পূজনীয়া মায়েরও আমাদের ভবিষ্যৎ জানার ইচ্ছা হল, সুতরাং তিনি তাঁকে ঘরে ডেকে আমাদের হাত দেখালেন। জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বললেন যে, এর ভাগ্যে ধন ও যশ তো অনেক আছে কিন্তু বিদ্যা নেই। সেই সময় আর্যসমাজের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। অতএব, আমি ভাগ্যকে অপরিবর্তনীয় রেখা বলে ভেবে নিলাম। আমার মনে হল, যে বস্তু ভাগ্যে নেই, তা তো পাওয়া যেতে পারেনা তাই যতই পরিশ্রম করা হোক না কেন। এই ভেবে আমি পড়াশোনাকে উপেক্ষা করতে শুরু করলাম এবং পরে পড়াই ছেড়ে দিলাম। কয়েক বৎসর পর সত্যার্থ প্রকাশ পড়ার সৌভাগ্য হল। তার স্বমন্তব্য প্রকাশ-এ লিখিত আছে—''পুরুষকার প্রারব্ধ থেকে বড়।'' এই বাক্যটি আমার জীবনে প্রকাশ স্তম্ভ প্রতিপন্ন হল এবং আমি নিজের জীবনকে বিদ্যার্জনের দিকে লাগালাম। যদিও আমি সেই সময় বিদ্যাধ্যয়নে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হলাম, তবুও আমি বিদ্যার্জন করলাম এবং সিদ্ধান্ত-শিরোমণি, বিদ্যাবাচস্পতি, শাস্□ী, প্রভাকর, বেদ শিরোমণি, এম.এ., পি.এইচ.ডি., ডি.এ. লিট্ (ডক্টর অফ্ আর্য়ন লিটারেচার)

ইত্যাদি সম্মানিত পদবী উপার্জন করলাম, বেদ পড়লাম, পড়ালাম, বেদের উপর লিখলাম, লিখালাম (পি.এইচ.ডি.-র ছাত্র দ্বারা) অনেক বৈদিক সিদ্ধান্তের উপর ব্যাখ্যান দিলাম এবং আজ আমি যা সব তারই কৃপা। সুতরাং সত্যার্থপ্রকাশ জীবনের রাস্তা দেখায়।

৩. সত্যার্থপ্রকাশ তথা অন্যমতের আলোচনা –

সত্যার্থ প্রকাশ সম্পর্কে লোকেরা এই অভিযোগ করে যে, এর মধ্যে অন্যান্য মতের আলোচনা করা হয়েছে। যারা অন্যের আলোচনা করে বা তাদের ভুল বের করে তাকে ধর্ম বলে স্বীকার করা যায় না কেননা মনু ধৃতিঃ, ক্ষমা ইত্যাদিকে ধর্মের লক্ষণ বলেছেন। খন্ডনকারীকে ক্ষমাশীল কীভাবে বলা যেতে পারে ? তাকে তো অসহিষ্ণু নাম দেওয়া দরকার। তারা কবীরকে —

পত্থর পূজে হরি মিলেঁ, তো ম্যায় পূজুঁ পহার।
উসসে তো চক্□ী ভলী, পিস খায় সংসার।।

(পাথর পূজায় যদি হরি পাওয়া যায়, তাহলে আমি পূজি পাহাড় তার চেয়ে তো চাকী ভাল যা পিশে খায় সংসার।)

বলতে শুনবে, কিন্তু কবীরের গণনা নিজেদের সাধু-সন্তের মধ্যে গর্বের সঙ্গে করবে। অথচ সত্যার্থপ্রকাশে মূর্তি পূজার সমালোচনা তার কাছে অসহ্য। সর্বপ্রথম বিচার্য বিষয় এই যে, সত্যার্থপ্রকাশের এই সমালোচনা সত্য না অসত্য। যদি সেখানে অসত্য সমালোচনা করা হয়ে থাকে তবে তার প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু প্রতিবাদ কী করে করবে ? কেননা সত্যার্থপ্রকাশ তাদেরই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের সত্য সমীক্ষা করা হয়েছে। আলোচ্যের আলোচনা হতেই হবে। যদি তার দ্বারা আলোচনা সত্য হয় তবে মনুষ্যের ধর্ম, কর্তব্য এই যে, সত্য গ্রহণ করতে এবং অসত্য ত্যাগ করতে সর্বদা উদ্যত থাকা

দরকার। দ্বিতীয়ত, যদি অন্যের সমালোচনা করা ঠিক না হয় তাহলে সাহিত্য ইত্যাদি প্রত্যেক প্রণালীর উপর যে সব আলোচনাত্মক গ্রন্থ লেখা হয়ে থাকে তার উপর প্রতিবন্ধ লাগুক। আমাদের কাছে এম.এ. প্রশ্নের উত্তর পুস্তিকা পরীক্ষণের জন্য আসে। যে সব ছাত্র প্রশ্নের উত্তর আলোচনা - প্রত্যালোচনাপূর্বক দেয় তাদেরকে আমরা ভাল নম্বর দিই এবং যারা সাধারণ উত্তর দেয় তাদেরকে সাধারণ নম্বর দেওয়া হয়। এখানেও সব বিদ্বানদের উপর প্রতিবন্ধ লাগিয়ে দেওয়া উচিত যে, যেসব ছাত্র আলোচনা প্রত্যালোচনা পূর্বক লিখবে তাদেরকে উত্তীর্ণ করা হবে না এবং যারা সাধারণ উত্তর দেবে তাদেরকে বেশী নম্বর দিয়ে উত্তীর্ণ করা হবে। এর ফলে কি বিদ্যার স্তর উঁচু হতে পারবে ? বা কোন চিন্তাবিদ্ এটা মানতে রাজী হবে ? যখন শিক্ষায় নিরন্তর সংস্□ার হেতু আলোচনা প্রয়োজন তখন ধর্মের সংস্□ার হেতু আলোচনার প্রয়োজন কেন নেই ? আপনি কি ধর্মে বিকৃতি কামনা করেন, সংস্□ার নয় ? মনে রাখবেন, যেমন আহারের বিকৃতি শরীরকে অসুস্থ করে দেয় সেইরূপ ধর্মের বিকৃতি অন্তঃকরণকে অসুস্থ করে দেয় এবং অসুস্থ মানসিকতা কারও ভাল করে না। আবার যদি ভুলকে ভুল না বলে ঠিক বলা হয় তবে সেই ভুলই ব্যক্তির সঙ্গে গ্রথিত হয়ে যায়। যদি যে যেমন চায় সেইরকম করতে দেওয়া হয় তাহলে শিক্ষক ছাত্রদের খাতা দেখেন কেন ? সব ঠিক আছে-লিখে দিলেই হল। আপনি কি আপনার শিশুদের জন্য এমন শিক্ষক পছন্দ করবেন যিনি ভুল প্রশ্নের উপর ঠিক চিহ্ন লাগান। করবেন না তো ? তাহলে ধর্মের ব্যাপারে ভুলের উপর ভুল চিহ্ন লাগানোকে অসহিষ্ণু কী করে বলতে পারেন ?

জনৈক আর্যপুরুষ একটা শিক্ষণ-সংস্থা চালান। একদিন

তাঁর কাছে একজন অভিভাবক এলেন। আর্য মহাশয় সে সময় সত্যার্থ প্রকাশ পাঠ করছিলেন। তাঁকে পড়তে দেখে সেই ভদ্রলোক বললেন – ''আপনি কি এটাও পড়েন ? এটা ভাল গ্রন্থ নয়। এর মধ্যে সবাইর খন্ডন করা হয়েছে। লোকের উচিত নিজের কথা বলা, কারও খন্ডন করা উচিত নয়। এমন ব্যক্তিকে লোকেরা অসহিষ্ণু মনে করে। আমার দৃষ্টিতে এমন করা ভুল। সবাইর স্বাধীনতা থাকা চাই, যে যেমন ইচ্ছা, তেমন লিখতে পারে।''

তাঁর চলে যাওয়ার পর আর্য ভদ্রলোক তৃতীয় শ্রেণীর, যাতে উক্ত মহাশয়ের ছেলে পড়ে, অধ্যাপিকাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন – মনোজ ক্লাসে কেমন পড়াশুনা করছে ? তিনি বললেন – অন্যান্য বিষয়ে তো সাধারণ কিন্তু গণিত দুর্বল। তখন আর্য ভদ্রলোক বললেন – ''আজ সে গণিতের যে প্রশ্নের সমাধান করবে তা না দেখে সবার উপর ঠিক চিহ্ন লাগিয়ে দেবেন।'' অধ্যাপিকা বললেন যে, তার বাবা প্রতিদিন তার খাতা দেখে, যদি আমি ভুলের উপর ঠিক চিহ্ন লাগাই তাহলে কালই এসে হাজার হবেন। তিনি বললেন যে, আপনি চিন্তা করবেন না, আমি সব সামলে নেব। অধ্যাপিকা এইরকমই করলেন। সেই দিন সেই ভদ্রলোক খাতা দেখে রাগে ফেটে পড়লেন। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন – কোন্ গাধা আজ তোর গণিতের খাতা পরীক্ষা করেছে ? শিশু উত্তর দিল যে, মমতা ম্যাডামই দেখেছেন। তিনি বললেন – গাধা, পাক্□া গাধা । ভুল প্রশ্নের উপরও ঠিক চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছে। পরদিন পিতা খাতা নিয়ে হাজির হয়ে রেগে বললেন – তৃতীয় শ্রেণির অধ্যাপিকাকে ডাকুন। আপনি এমন-এমন অধ্যাপিকাকে রেখেছেন যারা কিছু জানেনা। আপনি তাদের সরিয়ে দিয়ে যোগ্য অধ্যাপিকা রাখুন।

আর্য ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন – কী ব্যাপার ? আজ আপনি অত্যন্ত রেগে আছেন, দেখছি। তিনি বললেন – রাগের ব্যাপারই বটে। এই গণিতের প্রশ্নগুলি দেখুন। সমস্ত ভুল প্রশ্নের উপর ঠিক চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছে। আর্য ভদ্রলোক বললেন – এতে তাঁর কোন দোষ নেই। কাল আমিই বলেছিলাম যে, কারও খন্ডন করবে না। খন্ডনকারীকে অসহিষ্ণু বলা হয়, যে যেমন ইচ্ছা বলুক বা লিখুক। তিনি বললেন – এই ভাবে সমস্ত শিশুরা ফেল হয়ে যাবে। দেখুন, ভুলকে ভুল বলা উচিত এবং ঠিককে ঠিক। এই রকম না করলে বালক জানবে কী করে যে, তার কোন্ প্রশ্নোত্তর অশুদ্ধ এবং সে তার ভুল কীভাবে সংশোধন করবে ?

আর্য ভদ্রলোক বলতে লাগলেন – আমি আপনার কালকের আদেশ পালন করিয়েছি মাত্র। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, যখন আমরা এরকম করি তখন আপনি বলেন যে, খন্ডন আবশ্যক এবং যখন এই কাজ সত্যার্থপ্রকাশ করে তাহলে ভুল কী করে হয়ে গেল ? সেই ভদ্রলোক ঘাড় নিচু করে চলে গেলেন। তার পর উনি কখনও বলেননি যে খন্ডন করা উচিত নয়। আর্য ভদ্রলোক শিক্ষিকাকে প্রশ্নটা বোঝানোর জন্য বলে দিলেন।

৪. সত্যার্থ প্রকাশ এক দর্পণ –

সত্যার্থ প্রকাশ দর্পণের মতো যার যেমন মুখ তাকে সেইরকমই দেখিয়ে দেয়। কোন বৃদ্ধ যদি তার বলিভরা মুখ দেখে দর্পণকে দোষ দিতে শুরু করে তো এতে দর্পণের কী দোষ ? এইরূপ যদি ব্যক্তি সত্যার্থ প্রকাশের আলোচনায় ক্ষুব্ধ হয় তাহলে তাকে ভেবে দেখা উচিত যে, যদি সত্যার্থ প্রকাশে সত্য ও অসত্যকে স্পষ্ট করে দেখানো হয় তা এর দোষী অসত্য,

সত্যার্থ প্রকাশ বা তার মহান প্রণেতা মহর্ষি দয়ানন্দ নয়। মহর্ষি দয়ানন্দ তখন দোষী বলে সাব্যস্ত হতেন যখন তিনি সত্যকে অসত্যরূপে প্রকাশ করতেন। যদি তিনি অসত্যকে অসত্য বলে দিলেন তাহলে এটা ওনার দোষ নয়, বরং তার মহত্ত্ব বুঝতে হবে। মনে রাখবেন, সত্য কে সত্য বলা অনেক লোকের অভ্যাস থাকতে পারে কিন্তু অসত্যকে অসত্য বলার লোক খুব কমই পাওয়া যায়। অসত্যকে অসত্য যারা বলে তাদের গালি, পাথর, বিষ ও গুলি পুরস্□ার হিসাবে প্রাপ্ত হয়। দর্পণের দোষ যারা দেখেন তারা তাদের রূপের সংস্□ার করুন যাতে দর্পণে নিজের রূপ ভাল দেখা যায়। কেননা যেমন কে তেমন দেখানো দর্পণের কাজ, এর মধ্যে তার কী দোষ ?

অনেক দিন আগেকার কথা। গ্রামের এক যুবক কোন কারণে শহরে আসে। সেই সময় গ্রামের লোকের শহরে আসা এইরকম ছিল যেমন আজকাল বিদেশ যাওয়া। মোকদ্দমায় বা বিয়ের জিনিসপত্র নিতেই লোক শহরে যেত এবং ফিরে গিয়ে লোকদেরকে শোনা-নাশোনা অনেক গল্প বলত। মনে হত যেন সে চক্রব্যূহ ভেদ করে এসেছে। সেই যুবক শহরের এক দোকানে লোকদেরকে কোন একটা জিনিস হাতে নিয়ে চুল ঠিক করতে, বা তা দেখে বিবিধ ভঙ্গিমা করতে ও কিনতে দেখল। প্রথমে তো সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। তারপর সে সাহস সঞ্চয় করে দোকানদারের কাছে জিজ্ঞাসা করে — 'এরা সব কী দেখছে ?' দোকানদার আয়না তার সামনে রেখে বলল যে, তুমিও দেখে নাও। সে তার মধ্যে একজন সবল-সুস্থ যুবক দেখল। সে একটু মুচকি হাসল, আয়নার মধ্যে সেও মুচকি হাসে। সে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে — 'এর মধ্যে

কে আছে ?' দোকানদার তাকে বলে যে, এতে নিজের মুখ দেখা যায়, এই শুনে যুবক খুব প্রসন্ন হল এবং মনে মনে ভাবল আমি এত সুন্দর দেখতে। আমার বউও আমাকে বলে যে, তুমি দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু আমি ভাবি যে, আমাকে তেল দেবার জন্য এ সব বলছে। সে দোকানদারকে বলল – 'এখন তো শহর আসলেই আপনার এখানে এসে এটা দেখব।' দোকানদার – 'আপনি এটা কিনে নেন্, চার পয়সাই তো এর দাম।'

যুবক ভাবল যে, ঘোড়াগাড়িকে চার পয়সা না দিয়ে পায়ে হেঁটেই চলে যাব। চার ক্রোশ তো সবে। সে ঐ আয়নাটা কিনে নিল। দোকানদার তাকে সতর্ক করে দিল যে, এটা খুব কোমল জিনিস, পড়ে গেলেই ভেঙে যাবে। তখন আর জোড়া লাগানো যাবে না। একে সামলে রাখবে। যুবক সেটি ঘরে নিয়ে আসে এবং ভাবে যে, যদি কাউকে বলি তাহলে সে অন্যকে বলে দেবে। তখন সবাই দেখতে চাইবে এবং যদি কারও হাত থেকে ফসকে যায় তাহলে ভেঙে যাবে। সেটিকে সে নিজের ট্রাংকে কাপড়ের নীচে লুকিয়ে রেখে দেয়। সে সকালে ট্রাংক খোলে, সেটিতে নিজের মুখ দেখে খুশী হয়। এক দিন তার স্ত্রী দেখে ফেলে এবং জিজ্ঞাসা করে যে, কী দেখে তুমি এত খুশী হচ্ছো ? যুবক ঘাবড়ে গিয়ে আয়না ট্রাংকের ভিতর রেখে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তালা বন্দ করে দেয়। তার স্ত্রীর সন্দেহ হয় যে, কিছু একটা ব্যাপার আছে নিশ্চয়ই নচেৎ ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তালা কেন বন্দ করে দিল ? বলে যে, ও কিছু না। যখন কিছু না তখন দেখালো না কেন ? যে দিন থেকে শহর থেকে এসেছে কেমন যেন বদলে গিয়েছে সে তখন চাবি চুরি করার ফন্দি

আঁটতে থাকে। একদিন সে সফল হয়। যখন তার স্বামী স্নান করতে যায় সে তখন চাবিটি চুরি করে। তার চলে যাওয়ার পর শাশুড়ি থেকে লুকিয়ে ধীরে ধীরে তালা খুলে খুঁজতে থাকে। কাপড়ের নীচে আয়নাটি পেয়ে যায়। সেটিকে দেখে তার মধ্যে নিজের রূপ দেখতে পায়, একজন সুন্দরী যুবতী। সে ভাবে একে মনে হয় শহর থেকে এনেছে। সেই জন্য চাবি কাউকে দেয় না এবং এটাকে লুকিয়ে রেখে খুশী হয়। সে কান্না শুরু করে দেয়। হায়, আমার ভাঙা কপাল। এখন ওর আমার কী প্রয়োজন ? এখন তো ঘরে এই ডাইনী এসে গেছে। কেমন নির্লজ্জ। আমাকে দেখেও ভয় পাচ্ছে না, লজ্জিতও হচ্ছে না। ভয় কেন পাবে যখন ঘরের মালিকই তার হয়ে গিয়েছে ? চিৎকার করে কাঁদতে থাকে—হায়, আমার সব গেল, আমার ঘর শেষ হয়ে গেল।

চিৎকার শুনে শাশুড়ি দৌড়ে আসে যে, হঠাৎ বউমার কী হল ? সে এসে জিজ্ঞাসা করে যে, কী হয়েছে যে, তুমি কাঁদছ আর আবোল-তাবোল বকছ ? সে আয়নাটা তার সামনে রেখে দিয়ে বলে যে, দেখ, তোমার ছেলের কান্ড। শহরে গিয়েছিল এবং নিয়ে আসলো আমার বুকের উপর রাখতে পাথর, আমি যদি এতই খারাপ তবে আমায় বিয়ে করে এনেছিল কেন ? নিয়ে আসতো এই শয়তানীকে।

শাশুড়ি আয়না নিয়ে দেখে। তাতে নিজের বুড়ো রূপ দেখা যায়। দেখেই বলতে খাকে – ভরাডুবি করেছে। আনতে হলে কোন যুবতীকে আনতো। নিয়ে আসলো ষাট বছরের বুড়ি। না কোন কাজের, যত সব। বউমা বলে আপনি ছেলের পক্ষ নিচ্ছেন ? তাকে বুড়ি বলছেন। আপনার আশকারা পেয়ে

শহর থেকে নিয়ে এসেছে এবং এখন বলছেন – বুড়ি, ষাট বছরের। ষাটের হোক বা কুড়ির হোক। কেমন টমাটরের মতন গাল লাল-লাল। সমস্ত চুল কালো। এ সব ষাট বছরের হয়, না কুড়ি বছরের ? শাশুড়ি বলে – 'বৌ, আমি এই চুল রোদে সাদা করিনি। আমি কি অন্ধ যে, দেখতে পাই না। সমস্ত মাথার চুল সাদা এবং মুখে বলিরেখায় ভর্তি। এরকম কি কোন যুবতী হয় ?' এখন শাশুড়ি তাকে বুড়ি বলে আর বউ তাকে বলে যুবতী। দুইজনের উঁচু কলরব শুনে বুড়ো এসে জিজ্ঞাসা করে—এই ঘরে কান্নাকাটি আর বুড়ি-যুবতীর ঝগড়া শুরু হয়েছে। কী হয়েছে ? বউ জোরে জোরে কাঁদা শুরু করে আর বলে – কী হয়েছে আবার, আমার কপাল ভেঙেছে। ও তোমার বুকে নয় আমার বুকের উপর এনে রেখেছে। খাওয়াও আর এক নিষ্□র্মাকে। সারা জীবন না জানি কোথায় কেটেছে, এখন বুড়ো বয়সে এই ঘরের পাল্লা ধরেছে। বুড়ো বলে – 'আরে কোন কাজের কথা বলবে, না বুড়ি যুবতীর, আমি তিন বার দেখেছি।' বুড়ো-'কোথায় সে ? ঘরে তো দেখা যায় না। হেয়ালী শোনাতে থাকবে ? বুড়ি বলে–'আর কী হবে ? এক বুড়িকে নিয়ে এসেছে তোমার ছেলে ?' বউ বলে–'বুড়ি নয় যুবতী, বুড়ি দর্পণ কে বুড়োর সামনে রেখে দেয়।' তার মধ্যে সে একজন বুড়ো লোককে দেখে খুব হাসতে থাকে ও বলে – 'তোমাদের দু জনেরই মাথার ঠিক নেই। স্□ী-পুরুষ চিনতে পারে না ? তোমরা এটা তো একবার দেখতে যে, মেয়েদেরও কি মোঁছ হয় নাকি। আরে এ তো মোঁছওয়ালা বুড়ো একজন।'

পাঠকগণ ! এখন আপনি বলুন যে তিন ব্যক্তিরা দর্পণে নিজের নিজের রূপ দেখলো, এতে দর্পণের কী দোষ ? দর্পণ

তো যেমন মুখ ছিল তেমনই দেখিয়ে দিয়েছে। এই রকম সত্যার্থ প্রকাশও যথার্থতা দেখায়। যদি মুখ ঠিক না মনে হয় বদলে ফেল। প্রো০ শরর ঠিকই লিখেছেন –

আইনা চেহরে কা হর দাগ দিখা দেতা হ্যায়,
উসকী ফিতরত কা তকাজা হ্যায় তো শিকওয়া ক্যায়সা ?
আপ সত্যার্থ কী তনকীদ সে নারাজ ন হো,
জনাব, চেহারা ধো ডালিয়ে গুস্সা ক্যায়সা ?
[আয়না মুখের প্রতিটি দাগ দেখিয়ে দেয়,
এতো তার স্বভাব, তাহলে অভিযোগ কিসের ?
আপনি সত্যার্থের সমালোচনায় বিরক্ত হবেন না,
মশাই, মুখটা ধুয়ে ফেলুন, রাগ কীসের ?]

৫. সত্যার্থ প্রকাশে আলোচনা অত্যন্ত তীক্ষ্ম –

একটা অভিযোগ এও করা হয় যে, সমালোচনা তো প্রত্যেকে করে কিন্তু মহর্ষি দয়ানন্দ অত্যন্ত তীক্ষ্মআলোচনা করেছেন। যেটা ঠিক নয়। অল্প কিছু আলোচনা ঠিক ছিল কিন্তু এত কটু আলোচনা করার কোন দরকার ছিল না। এমন লোকদের কাছে নিবেদন যে, কাপড়ে লাগা সাধারণ ময়লা তো সাবানাদি দিয়ে ছাড়ানো যেতে পারে কিন্তু যদি তার উপর বছরের পর বছরের ময়লা জমা হয় তবে তাকে আঁচেও উঠাতে হয় এবং কাঁচতে বা ধোপার মোটা লাঠি দিয়ে পিটাতেও হয়, নতুবা ময়লা দূর হবে না। মেঝের উপর পড়া সামান্য আবর্জনা ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্□ার করা যেতে পারে কিন্তু যদি মেঝের উপর শতাব্দীর ময়লা জমা হয়ে থাকে তাকে ঝাঁটা দিয়ে সরানো সম্ভব নয়। তাকে সরাতে গেলে খুরপা, কোদাল বা তারের বুরুশ কাজে লাগাতে হয়। এই প্রকার সংস্□ৃতির উপর পড়া

অনেক শতাব্দীর ময়লা দূরীভূত করার জন্য মহর্ষি দয়ানন্দকে খন্ডনরূপী তীক্ষ্ম খড়ুগ উঠাতে হল। তাছাড়া কাজ চলতেই পারে না। হালকা ওষুধে দীর্ঘকালীন রোগ দূর হয় না।

৬. সত্যার্থ প্রকাশের তীক্ষ্ম আলোচনার ফল –

বিজ্ঞজনেরা স্বীকার করেন যে, জাতিতে আজ যে জীবন পাওয়া গিয়াছে তা তার তীক্ষ্ম আলোচনার ফল। স্ত্রী শিক্ষা, শুদ্ধি প্রচার, অস্পৃশ্যতা নাশ, বাল্য বিবাহ, অমিল বিবাহ, জন্ম থেকে জাতি প্রথা, বিধবা বিবাহ, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, ভোজন সম্বন্ধী গোলযোগ, সমুদ্র পার করাকে ভ্রষ্ট মনে করা, সবার সহিত সমভাব ইত্যাদি তাদের তীক্ষ্ম আলোচনারই মিষ্টি ফল। তিনি যদি ঠোকর না মেরে জাগাতেন তাহলে জাতি শুয়ে থাকত এবং পরিণাম হত — তার মৃত্যু। তাঁর তীক্ষ্ম খন্ডন জাতিকে এমন ভাবে বাঁচিয়েছে যেমন এক যুবকের তীক্ষ্ম শব্দ পঞ্চায়েতের প্রধানকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। দেখুন—

এক গ্রামের পঞ্চায়েতের প্রধানকে সাপে কেটেছে। প্রধান অত্যন্ত সজ্জন, ন্যায়প্রিয়, দয়ালু তথা সৎ ব্যক্তিছিলেন। তাঁর ন্যায়ে দুধের দুধও জলের জল হত। তাঁর পক্ষে ছোট-বড় সব সমান ছিল। ন্যায় তো ন্যায়ই, সে ছোট-বড়কে সমান নজরে দেখে। তার সামনে অপরাধী কেবল অপরাধী তথা নিরপরাধ কেবল নিরপরাধী, তাই সে যেই হোক না কেন। কয়েক বার বড় লোকেরা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে যেত, কেননা তারা যদি অপরাধ করত, শাস্তি থেকে রেহাই পেত না। বড় লোকেরা নিজেকে অন্যদের থেকে বিশিষ্ট মনে করে এবং তাদের ইচ্ছা যে, তাদের সঙ্গে বিশেষ ব্যবহার করা হোক। কিন্তু পঞ্চায়েতের প্রধান শাস্ত্র দেখেছিলেন যে, ন্যায়াসনের

উপর বসে যে ন্যায় করে না, অন্যায়ের ফল তাকে পেতেই হয়। সুতরাং ন্যায়াধীশকে নিজের তথা ন্যায়ের রক্ষা করার জন্য ন্যায়ই করা উচিত, তাই কেউ খুশী হোক বা অখুশী। ন্যায়ের আসন পরমাত্মার আসন হয়ে থাকে। প্রধান শাস্ত্রের কথা মনে গেঁথে রেখেছিলেন এবং সেই মতো সর্বদা আচরণ করতেন। এইজন্য তাঁর সর্পদংশনে সবাইর, বিশেষ করে দুর্বল বর্গের চিন্তা ছিল যে, যদি তিনি না থাকেন কে তাদেরকে ন্যায় দেবে ? তিনি না থাকলে আমরা সবাই অনাথ হয়ে যাব।

অবিলম্বে সর্পবিষ-চিকিৎসককে ডাকানো হল। তিনি মনোযোগপূর্বক তাঁর চিকিৎসা করলেন। কিন্তু এই বলে দিলেন যে, যদি রাতভর এনাকে ঘুমাতে না দেওয়া হয়, তবে ইনি বেঁচে যেতে পারেন। অন্যথা কী হবে, বলা যায় না। গ্রামবাসীরা নাচ-গান, ঢোল-করতাল বাজিয়ে তাঁকে জাগিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকলেন। রাত দশটা পর্যন্ত তারা তাঁকে জাগিয়ে রাখতে সফল হলেন, কিন্তু এর পর ঝিমুনি আসতে লাগল। ঘুম যখন বেশী পেতে লাগল তখন তিনি সবাইকে বললেন – আমাকে আর বিরক্ত কর না। যা হবার তা হবে। এখন আমাকে আরামে ঘুমাতে দাও। ঘুমানোর কী পরিণাম কারও অজানা ছিল না – পঞ্চায়েতের প্রধানের মৃত্যু। তাঁকে সদা-সর্বদার জন্য হারানো। সবাই একে অন্যের মুখ দেখতে থাকল। কিছু ভাবপ্রবণ ব্যক্তিরা আগামী বিপদের কথা ভেবে কাঁদতে শুরু করল। সবাই কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ল। কী করা যায়, এ কারও মাথায় আসছিল না। সবাই চিন্তিত ও হতাশ। এর মধ্যে জনৈক যুবক এগিয়ে এসে বলল – আপনারা যদি আমার অপরাধ ক্ষমা করেন তাহলে এঁকে আমি সারা রাত

জাগিয়ে রাখতে পারি। লোকেরা বলল যে, আপনি এঁকে সারা রাত জাগিয়ে রাখুন, ক্ষমার দায়িত্ব আমাদের উপর থাকল। সেই যুবক প্রধানের আত্মভিমানকে জানত। বাল্যকাল থেকে সে দেখে আসছে সবাই তাঁর সামনে নত মস্তক হয়, আজ পর্যন্ত কারও এতটা সাহস হয়নি যে, তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলে। সেই যুবক ঝিমানো চোখের প্রধানকে বলল – 'এ প্রধান!' প্রথমে তো যুবকটির এই ভাবে সম্বোধন করা তাঁর মনে খুব বাজল। তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে তাঁকে দেখে বললেন – 'শিষ্টতা বজায় রেখে কথা বল।' কেননা যে ভাবে যুবক বলেছিল, প্রধান তা শুনতে আদৌ অভ্যস্ত ছিলেন না। লোকেরা তাঁকে বিনম্র ভাবে সম্বোধন করত। এখানে এই যুবক গোয়ার্তুমি ঢঙে কথা বলছিল। কিন্তু এখানেই থামেনি সে। যুবক উত্তর দিল 'অনেক দিন ধরে আপনি শিষ্টতা শিখিয়েছেন। এখন আগে যাওয়ার জন্য তৈরী হন্। সমস্ত জীবন লোকেরা চেপে রয়েছে এখন কেউ আর চেপে থাকবে না। আমরাও মানুষ। এখানে কারও অপেক্ষা কেউ কম নয়। আমরাও সমান্ পর্যায়ের। আপনার যা করার, করে নিন্।' যুবক এই বলে তো চলে গেল, কিন্তু পঞ্চায়েতের প্রধানের রক্ত গরম হয়ে উঠল – 'এর এতখানি সাহস হয় কী করে ? ধরতো একে, হাড়গোড় ভেঙে দাও এর। ছোকরার এত ধৃষ্টতা। এখনও তো আমি বেঁচে আছি। কাল যদি এর চামড়ায় ভুষি না ভরিয়েছি, তখন বুঝতে পারবে। ভেবেছে, আমি মরে গিয়েছি ? সেজন্য এত আবোল-তাবোল বকছে ? আজ পর্যন্ত কত নম্র হয়ে থাকত। মনে হত যেন নম্রতার প্রতিমূর্তি। আসল রহস্য ফাঁস হল। এই হল দুনিয়া। জীবিতের সম্মুখে নত হয় আর মরার সময় নিন্দা

করে। আমি এর পরিবারের এত উপকার করেছি যে, সাত জন্ম ধরে এ শোধ করতে পারবে না।' তার কথায় এত দুঃখ হল যে, ক্রোধবশত সারা রাত ঘুমাতে পারলেন না এবং বেচে গেলেন।

প্রাতঃকালে যখন ডাক্তার একে দেখে প্রসন্নতা ব্যক্ত করলেন এবং গ্রামবাসীদেরকে বললেন যে, এখন আপনাদের প্রধান বিপদ্ মুক্ত হয়ে গিয়েছেন তখন গ্রামবাসীদের চোখে আনন্দের অশ্রু দেখা গেল। তারা ডাক্তারকে বলল যে, ইনি ঘুমাতে চাইছেন, আমরা বহু চেষ্টা করেও যখন এর ঝিমুনি রোধ করতে পারলাম না তখন একজন বুদ্ধিমান যুবক একে বাঁচানোর জন্য নির্মম শব্দ বলে দিল যার ফলে এর ক্রোধ এসে গেল এবং সমস্ত রাত ক্রোধবশত ঘুমাতে পারেননি।

ডাক্তার প্রধানকে বললেন — 'সর্পবিষের নেশায় আপনি নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। যদি আপনি ঘুমিয়ে পড়তেন, তাহলে আমরা আপনাকে বাঁচাতে পারতাম না। সেই যুবক যে আপনার সঙ্গে নির্মম ব্যবহার করেছিল, সেটা সে অসভ্যতাবশত করেনি বরং আপনাকে বাঁচানোর জন্য করেছিল। আজ আপনার জীবন সেই যুবকের নির্মম ব্যবহারের পরিণাম। যদি সে নির্মম শব্দ প্রয়োগ না করতো আপনি মারা যেতেন। তার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

প্রধান এতক্ষণে সব বুঝতে পারলেন। তিনি সেই যুবককে ডাকলেন। সে তাঁর পা ধরতে গেল, তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং পুরস্□ৃতও করলেন।'

মহর্ষি দয়ানন্দের কঠোর আলোচনায় জাতি (মানব জাতি) ঘুমাতে পারিনি এবং মরা থেকে বেচে গেল। কিন্তু না জানি

তাঁকে পুরস্‌্‌ত কবে করবে ? সময় আসবে যখন তাকে জাগানো এবং মরা থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁকে হৃদয় দিয়ে অভিনন্দন করবে এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে তাঁকে পুরস্‌্‌ত করবে। কৃতঘ্নতা অবশ্যই পাপ। জাতি নিজের মাথায় এই পাপ কেন বহন করবে ? সে সংসারের এই অদ্ভুত বৈপ্লবিক গ্রন্থ সত্যার্থ প্রকাশের মহান রচয়িতা মহর্ষি দয়ানন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে নিয়ে তাঁর কালজয়ী অমর কৃতি সত্যার্থপ্রকাশ তথা অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করে, পাঠ করিয়ে তার মধ্যে অন্তর্নিহিত মন্তব্যগুলি গ্রহণ করে তার থেকে লাভান্বিত হবে এবং নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং তার জয়ঘোষে দিগন্ত মুখরিত করবে।

মহর্ষি বিচার

প্রশ্ন – ঈশ্বর নিজের ভক্তদের পাপ ক্ষমা করেন কিনা ?

উত্তর - না, কারণ পাপ ক্ষমা করলে তাঁর ন্যায় নষ্ট হয়ে যাবে। ন্যায় নষ্ট হলে মনুষ্যরা মহাপাপী হয়ে যাবে। কেননা, ক্ষমার কথা শুনে তারা পাপকর্মে নির্ভীক হয়ে উঠবে। রাজা অপরাধীদের ক্ষমা করলে তারা উৎসাহের সঙ্গে আরও গুরুতর পাপ করতে থাকবে। কারণ, রাজা তাদের অপরাধ ক্ষমা করলে তাদের এই ভরসা যে, রাজার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ালে রাজা তাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। ফলে যারা অপরাধ করে না, তারাও নির্ভয়ে পাপকর্মে প্রবৃত্ত হবে। সুতরাং সব কর্মের যথোচিত ফল প্রদান করাই ঈশ্বরের কার্য – ক্ষমা করা নয়।

(সত্যার্থ প্রকাশ সপ্তম সমুল্লাস থেকে)

মহর্ষি দয়ানন্দ মুখ্য-মুখ্য সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে

(ক) '' ....মহর্ষি দয়ানন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনুষ্য হয়, এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

......অন্য কোন প্রতিভাশালী পুরুষ অপেক্ষা এবং যা কিছু উপকার দেশ ও জাতির হয়েছে, সর্বপ্রথম স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীই আমাদের সামনে রাখলেন....যদি আমরা ঋষিদের সন্তান হওয়ার সোভাগ্য লাভ করেছি এবং এর জন্য আমরা গর্ববোধ করে থাকি তাহলে বলতে হবে যে, ঋষি দয়ানন্দ থেকে বেশী আমাদের উপকার এদিকে কোন অন্য মহাপুরুষ করেনি, যিনি স্বয়ং কিছু না নিয়ে আমাদের অপার জ্ঞান-রাশি বেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।''

''বিভিন্ন মত-পথের প্রচলন দেশের পতনের কারণ, স্বামীজির এ ধারণা নির্ভুল ছিল। তিনি মত-মতান্তরের উপর প্রমাণসহিত অভিযোগ উঠালেন.....তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, এই মতবাদের অজ্ঞান-পঙ্ক থেকে দেশকে বের করে বৈদিক শুদ্ধ শিক্ষা দ্বারা নিষ্‌্‌লঙ্ক করা।''

'' ....আর্যাবর্তের অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্‌্‌ী-শিক্ষার বিস্তারের বেশী সংখ্যক শ্রেয় আর্য সমাজকে দেওয়া যেতে পারে।''

–পঃ সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা'

(খ) ১৮৮৩ সালে স্বামী দয়ানন্দের মৃত্যু হয় এবং ১৮৮৪ সালে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের। স্বামী দয়ানন্দ ২০ বছর কাজ করেছেন এবং ভারতেন্দু ২১ বছর। এই দু জন মহানুভব এমন সাংস্‌্‌তিক প্রভাব ছেড়ে গেছেন যা দিন দিন শীঘ্রগতিতে বেড়েই চলেছে এবং যারা সম্পূর্ণ উত্তর-ভারতে জাগরণের এক নতুন তরঙ্গ উৎপন্ন করে দিলেন।

.....স্বামী দয়ানন্দের প্রবচনে অধিক আকর্ষণ এই ছিল যে, তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। অন্ধসংস্‌্‌ারের বিরোধী এবং প্রগতির সমর্থক

ছিলেন। একদিকে তিনি প্রাচীনতম বৈদিক সাংস্□ৃতিকে দৃঢ়তা পূর্বক ধরে ছিলেন। অন্যদিকে তিনি নতুন নতুন সংস্□ারকে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং জনসাধারণ কে তার উপর অগ্রসর হওয়ার জন্য বলতেন। তিনি পাশ্চাত্য ক্রমোৎকর্ষের সমর্থক ছিলেন কিন্তু বাস্তবে বৈদিক সাংস্□ৃতিময় ছিলেন।

— আচার্য চতুরসেন শাস্□ী

(গ) ''.....সংঘর্ষরত হিন্দুত্বের যেমন নির্ভীক নেতা স্বামী দয়ানন্দ হয়েছেন সেই রকম আর কেউ হয়নি। দয়ানন্দের সমকালীন অন্যান্য সংস্□ারকরা কেবল সংস্□ারক ছিলেন কিন্তুদয়ানন্দ বিপ্লব গতিতে এগিয়ে চললেন। তিনি হিন্দু ধর্মের রীতিকালের ঠিক রক্ষক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বমানবতার ও নেতা ছিলেন।''

''রীতিকালের ঠিক পরবর্তী কালে হিন্দী ভাষা-ভাষী ক্ষেত্রে যে সবচেয়ে বড় সাংস্□ৃতিক ঘটনা ঘটল, তা স্বামী দয়ান্দের পবিত্রতাবাদী বিচার ছিল। এই যুগের কবিদের শৃঙ্গাররসের কবিতা লেখার সময় এই রকম মনে হত যেন স্বামী দয়ানন্দ পাশে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছেন।''

– ডঃ রামধারী সিংহ 'দিনকর'

(ঘ) ''স্বামী দয়ানন্দ যুগ দ্রষ্টা, যুগ নির্মাতা ছিলেন। আমার সংস্□ারের উপর ঋষি দয়ানন্দের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। স্□ীদেরকে বেদাধিকার প্রদান করে তিনি মহিলাদের মধ্যে নবীন বিপ্লবের বীজ রোপন করেন। নারীর বেদনা দেখে তিনি বলতেন–ভাই, এর চেয়ে বেশী হৃদয় বিদারক দুঃখ কী হতে পারে ? বিধবাদের দুঃখপূর্ণ আর্তনাদে এই দেশের সর্বনাশ হচ্ছে। দয়ানন্দ বেদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে, বৈদিক অধ্যয়ন প্রণালীতে একটা নতুন যুগের সূত্রপাত করলেন। এই সব কাজের জন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী।''

– মহাদেবী বর্মা

(ঙ) ''স্বামী দয়ানন্দের বাক্য আমি বেদবাক্যবৎ মান্য করি, এবং তাঁর কথা আমার পক্ষে উদাহরণস্বরূপ।''

হিন্দুদের মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ ভগবানের বিভূতি।

''লোকেরা স্বামী দয়ানন্দকে মূর্তিপূজা না মানার কারণে মন্দ বলে কিন্তু কাশীর পণ্ডিতদের উপর সহস্র ঔরংজেব আক্রমণ করুক। দন্ডী বিরজানন্দ সত্য বলেছিলেন – কথং কাশী বিদুষ্মতী ?''

– বৃন্দাবনের বৈষ্ণব আচার্য পঃ রাধাচরণ গোস্বামী

(চ) ''.....স্বামী দয়ানন্দ যুগ নির্মাতার মতো দেশের সুপ্তমস্তিস্□কে প্রবুদ্ধ করার চেষ্টা করলেন....সত্যার্থ প্রকাশ এই দিক দিয়ে তার মহত্ত্ব বজায় রাখে। সামাজিক জীবনকে প্রেরণা দান করা এবং অতীত সংস্□ৃতির পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত....আর্যসমাজের কাজ প্রশংসনীয় রয়েছে। তাতে প্রতিক্রিয়া ভাবনার বদলে নবনির্মাণের বাস্তবিক চাহিদা মুখ্য রেয়েছে।''

– জয়শংকর প্রসাদ

পাঠক কৃপা করে মনোযোগ দিবেন

১। সত্যান্বেষী এবং শীঘ্র জানতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা বিজ্ঞানী সন্ন্যাসী স্বামী সত্যপ্রকাশ সরস্বতীর ভূমিকাযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ ট্রাস্ট বিভাগ, আর্য সমাজ চৌক, প্রয়াগ দ্বারা সন্ ১৯৭৪ খ্রীঃ প্রকাশিত সত্যার্থ প্রকাশ কিঁউ পঢ়ে ? (সত্যার্থ প্রকাশ কেন পড়বেন ?) লেখক-চন্দ্রপ্রকাশ এম.এ.বি.এড্. কেও পড়বেন। মহান শিক্ষাবিদ্ স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতী রচিত সত্যার্থ ভাস্□র (দুই খন্ডে) সত্যার্থ প্রকাশের ব্যাখ্যায় লিখিত গ্রন্থও অতান্ত পাঠযোগ্য।

২। বেদোক্ত সনাতন ধর্মের মান্যতার সম্পর্কে বা সত্যার্থ প্রকাশের প্রণেতা মহর্ষি দয়ান্দ সরস্বতী বা তাঁর পরম্পরার বিদ্বানদের লেখা বা অভিব্যক্তির উপরে অথবা আর্য সমাজের সিদ্ধান্ত পক্ষের উপর কারও কোনপ্রকার জিজ্ঞাসা বা সন্দেহ নিরশন হেতু আপনি প্রকাশকের সঙ্গে লিখিত সম্পর্ক করতে পারেন। পক্ষপাত মুক্ত সমীচীন আলোচনা অথবা সমীক্ষা অভিনন্দন যোগ্য।

৩। আমাদের সন্ত প্রকাশনের উপর সুধী পাঠকদের আলোচনা/

প্রতিক্রিয়া সমীক্ষা অভিনন্দীয় ।

হায়! সত্যার্থপ্রকাশের প্রণেতার নিরভিমানতা ও নিশ্ছল মনকে মানব আজও বোঝার চেষ্টা করত!!

ঋষিবর দয়ানন্দের নিজেরই শব্দের উপর মনোযোগ দিন —

''.....ব্রহ্মা থেকে নিয়ে জৈমিনী মুনি পর্যন্ত স্বীকৃত ঈশ্বরাদি পদার্থ যাকে আমিও স্বীকার করি, সব সজ্জনদের সম্মুখে প্রকাশিত করছি।.....আমার কোন নবীন কল্পনা বা মতমতান্তর চালানোর লেশমাত্রও অভিপ্রায় নেই কিন্তু যা সত্য তা স্বীকার করা বা করানো এবং যা অসত্য তাকে ত্যাগ করানো আমার অভীষ্ট।''

.....সংক্ষেপে স্বসিদ্ধান্ত দেখিয়ে দিয়েছি। এর বিশেষ ব্যাখ্যা সত্যার্থপ্রকাশের প্রকরণে আছে....যে যে কথা সবার মাননীয় তা মানা অর্থাৎ যেমন সত্য বলা সবার সামনে ভাল এবং মিথ্যা বলা মন্দ। এমন সিদ্ধান্তকে স্বীকার করি এবং যা মতমতান্তরের পরস্পর বিরুদ্ধ ঝগড়া তা আমি পছন্দ করি না কেননা....মতবাদীরা নিজের নিজের মতের প্রচার করে মনুষ্যকে জালে আবদ্ধ করে পরস্পরকে শত্রু বানিয়ে দিয়েছে....সত্যের প্রচার করে, ঐক্যমতে এনে, দ্বেষ ছড়িয়ে পরস্পরে দৃঢ় প্রীতিযুক্ত করিয়ে সবার থেকে সবাইকে সুখ লাভ পৌঁছানোর জন্য আমার প্রচেষ্টা ও অভিপ্রায়। সর্বশক্তিমান পরমাত্মার কৃপায় সাহায্য ও আপ্তজনদের সহানুভূতি দ্বারা.....সবাই....সর্বদা উন্নত ও আনন্দিত থাকুক, এই আমার মুখ্য প্রয়োজন।।

ইতিহাসের সেই কালখণ্ডে যখন আমাদের দেশের উপর বিধর্মীদের চতুর্দিক আক্রমণ হচ্ছিল তথা আমাদের দেশবাসীদের মনোবল হ্রাস পাচ্ছিল, আর্য সমাজের প্রবর্তক মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর অপূর্ব যোগবলে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা বেদকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল স্রোত ঘোষণা করে প্রতিপন্ন করলেন যে, আমাদের এই মহান দেশ বিদ্যা ও বিজ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে মুখ্য ছিল।

–০–

"Ishvara (God) is existent, intelligent and blissful. He is formless, Omssiscient, just, merciful, unborn, endless, unchangeable, beginningless, unequalled, the support of all, the master of all, omnipresent, immanent, unaging, immortal, fearless, eternal and holy, and the maker of all. He alone is worthy of being worshipped."

[ঈশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, ন্যায়কারী, দয়ালু, অজন্মা, অনন্ত, নির্বিকার, অনাদি, অনুপম, সর্বাধার, সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্যামী, অজর, অমর, অভয়, নিত্য, পবিত্র ও সৃষ্টিকর্তা, তারই উপাসনা করা উচিত।]

oooo

"One should always be ready to accept truth and give up untruth."

[সত্য গ্রহণ করতে ও অসত্য ত্যাগ করতে সর্বদা উদ্যত থাকা উচিত।]

– Swami Dayanand Saraswati

প্রকাশকীয় বক্তব্য

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর গুরু বিরজানন্দের কাছে তিন বৎসর আর্ষ গ্রন্থের অধ্যয়ন করেন। এই তিন বৎসরের অধ্যয়ন তাঁর জীবন, তাঁর চিন্তাধারায় যে বিপ্লব এনে দিয়েছিল তদ্দ্বারা ভারতের গত এক শ' বৎসরের ইতিহাস তৈরী হয়ে গেল। এই বিপ্লবের মূল স্রোত তাঁর গ্রন্থ সত্যার্থ প্রকাশ। সত্যার্থ প্রকাশ ১৮৭৪ সালে মোরাদাবাদের রাজা জয়কৃষ্ণ দাসের অনুরোধে মাত্র সাড়ে তিনমাসের মধ্যে লেখা হয়, এটা আশ্চর্যের কথা যে, এই বৃহৎ কায় অথচ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ পণ্ডিত গুরুদত্ত ১৪ বার পাঠ করার পর বলেছিলেন যে, প্রতি বার পাঠ করে তিনি নতুন নতুন রত্ন হাতে পেয়েছেন।

যারা সত্যার্থ প্রকাশের গভীর অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা জেনেছেন যে, এই বইতে ৩৭৭ গ্রন্থের উল্লেখ আছে, ১৫৪২ বেদ মন্□ বা শ্লোকের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। সত্যার্থ প্রকাশ এক মৌলিক চিন্তাধারার গ্রন্থ যা সমাজকে ভালমত কাঁপিয়ে দিয়েছে। মার্ক্সের দাস ক্যাপিটাল গ্রন্থ ইউরোপের আর্থিক কাঠামোকে নাড়িয়ে দেয়, মহর্ষি দয়ানন্দ ভারতের সাংস্□তিক ও সামাজিক কাঠামো নাড়িয়ে দেয়।

সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখলে ১৪ সমুল্লাসের এই গ্রন্থে আপনি সবরকম সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন। প্রথম দশ সমুল্লাস সমস্ত বিদ্যা পাঠ করার জন্য এবং পরের চার সমুল্লাস তার সর্বত্র প্রচার করার জন্য। মহর্ষি দয়ানন্দ লিখেগেছেন যে, যতক্ষণ মনুষ্য সত্যাসত্য বিচারে কিছু সামর্থ্য না বৃদ্ধি করে ততক্ষণ স্থূল ও সূক্ষ্ম খণ্ডনের অভিপ্রায় উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

হিন্দু সমাজে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল বেদ নিয়ে, এখানে প্রত্যেকে প্রতি কথায় বেদের উচ্চারণ করত। স্□ী ও শূদ্রের বেদ পাঠ করার অধিকার নেই কেন ? কেননা বেদে আছে। বাল্য-বিবাহ কেন হওয়া

A

উচিত ? বেদে লেখা আছে। জন্ম থেকে বর্ণ ব্যবস্থা কেন মানা হবে ? কেননা বেদে উল্লেখ আছে। যখন ঋষি দয়ানন্দ দেখলেন যে, বেদের নাম নিয়ে প্রতিটি সংস্□ত বাক্যকে বেদ বলা হচ্ছে এবং বেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বেদ মন্□র অনর্থ করা হচ্ছে তখন তিনি নিশ্চয় করলেন যে, বেদকেই কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজের রক্ষা করা যেতে পারে এবং সেই রক্ষা তখনই হতে পারে যখন জনসাধারণ বুঝতে পারবে যে, বেদে কী আছে এবং বেদে কী বলা হয়েছে ? ঋষি দয়ানন্দ বেদ দিয়ে বেদের উপর আঘাত হানলেন। সত্যার্থ প্রকাশের উত্তরার্ধে এই বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে।

সত্যার্থ প্রকাশ নিয়ে সম্প্রদায়বাদীদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। এমনকি মামলা কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে কিন্তু নির্ণয় সর্বদা সত্যার্থপ্রকাশের পক্ষেই হয়েছে। যার ফলে আমরা সগর্বে বলতে পারি সত্যের বিজয় সর্বদা হতে থাকবে।

জনমানস এই মহান গ্রন্থরত্ন সত্যার্থ প্রকাশের সঙ্গে আরও বেশী পরিচয় লাভ করুক এই উদ্দেশ্য নিয়ে মহান দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ্ আচার্য সত্যব্রত রাজেশের এই লেখা হিন্দী থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হলো। আশা করি পাঠক এই প্রচেষ্টার ফলে অত্যন্ত লাভান্বিত হবেন এবং এটা পাঠ করে সত্যার্থ প্রকাশ দ্বারা নিজের ঘর শোভাযুক্ত করে নিজের পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের উন্নতিতে সহায়ক সিদ্ধ হবেন।

ওম্ শম্ ।

B

।।ওতম্।।

সত্যার্থ প্রকাশ – এক মূল্যাঙ্কন

(An evaluation of Satyartha Prakashan)



লেখক ঃ

ডঃ সত্যব্রত 'রাজেশ'

এম.এ., পি.এইচ.ডি., ডি.এ.লিট্,
সিদ্ধান্তশিরোমণি, বিদ্যা বাচস্পতি, শাস্□ী

অনুবাদক

সতীশ চন্দ্র মণ্ডল

বিদ্যা রত্ন, সাহিত্যালংকার

Cover - 1

প্রকাশক ঃ

বৈদিক অনুসন্ধান ট্রাস□

আর্য সমাজ মন্দির
১৯, বিধান সরণী
কোলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম সংস্□রণ - মার্চ ২০১৭

মূল্য - ১০.০০ টাকা

অক্ষর - **অম্বিকা প্রসাদ দুবে**

মুদ্রক ঃ
সাধনা প্রেস
৪৫/১, এফ. বিডন স্ট্রীট
কোলকাতা-৭০০০০৬

Cover - 2

সত্যার্থ প্রকাশ কেন লিখলাম

‘‘......আমার এই গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য প্রয়োজন – সত্য সত্য অর্থের প্রকাশ করা অর্থাৎ যা সত্য তাকে সত্য এবং যা মিথ্যা তাকে মিথ্যাই প্রতিপাদন করাকেই আমি সত্যার্থের প্রকাশ বলে বুঝেছি। সত্যের স্থানে অসত্য ও অসত্যের স্থানে সত্য প্রকাশ করাকে সত্য বলা যায় না। কিন্তু যে পদার্থ যেমন তাকে সেইরূপ বলা, লেখা ও মানাকে সত্য বলে।’’

যদিও আমি আর্যাবর্ত দেশে জন্মগ্রহণ করেছি এবং বাস করছি, তথাপি যেরূপ এতদ্দেশীয় বিভিন্ন মতের মিথ্যা বিষয়গুলির প্রতি পক্ষপাত না করে তা যথা ভাবে প্রকাশ করছি সেরূপ ভিন্ন দেশীয় এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গেও আচরণ করছি। মনুষ্যের আত্মা সত্যাসত্যের জ্ঞাতা তথাপি সে স্বীয় প্রয়োজন-সিদ্ধি, হঠকারিতা, দুরাগ্রহ এবং অবিদ্যাদির দোষ বশতঃ সত্য পরিত্যাগ করে অসত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু এই গ্রন্থে সেরূপ কোন কথা রাখা হয়নি এবং কারও মনে ব্যথা দেওয়া বা কারও অনিষ্ট করা আমার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু যাতে মনুষ্য জাতির উন্নতি ও উপকার হয় এবং মনুষ্যরা সত্যাসত্য জেনে সত্যগ্রহণ ও অসত্য পরিত্যাগ করে তাই অভিপ্রায়, কেননা সত্যোপদেশ ব্যতীত মানবজাতির উন্নতির অপর কোনও উপায় নেই।

– দয়ানন্দ সরস্বতী

।। আর্য সমাজের দশ নিয়ম ।।

১. সব সত্য বিদ্যা এবং যে পদার্থ বিদ্যা দ্বারা জানা যায় সে সকলের আদিমূল পরমেশ্বর।

২. ঈশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, ন্যায়কারী, দয়ালু, অজন্মা, অনন্ত, নির্বিকার, অনাদি, অনুপম, সর্বাধার, সর্বেশ্বর সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্যামী, অজর, অমর, অভয়, নিত্য, পবিত্র ও সৃষ্টিকর্তা, তাঁহারই উপাসনা করা উচিত।

৩. বেদ সব সত্যবিদ্যার পুস্তক, বেদের পঠন-পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ সব আর্যের পরম ধর্ম।

৪. সত্য গ্রহণে ও অসত্য পরিত্যাগে সদা উদ্যত থাকিবে।

৫. সব কাজ ধর্মানুসারে অর্থাৎ সত্য ও অসত্য বিচারপূর্বক করা উচিত।

৬. সংসারের উপকার করা এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি করা ।

৭. সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্বক ধর্মানুসার যথাযোগ্য ব্যবহার করা উচিত।

৮. অবিদ্যার নাশ ও বিদ্যার বৃদ্ধি করা উচিত।

৯. প্রত্যেককে নিজের উন্নতিতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়, কিন্তু সকলের উন্নতিতে নিজের উন্নতি ভাবা উচিত।

১০. সব মনুষ্যকে সামাজিক সর্বহিতকারী নিয়ম পালনে পরতন্ত্র এবং প্রত্যেক হিতকারী নিয়মে সবাইকে স্বতন্ত্র থাকা উচিত।